বঙ্কিম-রবীন্দ্র
সম্পর্ক-সন্ধান

বদিউর রহমান

ঐতিহ্য

উ ৎ স র্গ

বরিশালের
আনিসুর রহমান স্বপন
ফয়জুন্ নাহার শেলী

সূচি

অধ্যায় এক
কবিতা ১৩

অধ্যায় দুই
বঙ্কিম-রবীন্দ্র নৈকট্য-দূরত্ব ১৯

অধ্যায় তিন
রবীন্দ্র-রচনায় বঙ্কিমপ্রসঙ্গ ৮৭

অধ্যায় চার
রবীন্দ্র-উপন্যাসে বঙ্কিম প্রসঙ্গ ১১০

অধ্যায় পাঁচ
বঙ্কিম-সাহিত্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ১১৩

অধ্যায় ছয়
রবীন্দ্র-ভাবনায় বঙ্কিম ১৪৩

অধ্যায় সাত
রবীন্দ্র ভাষণে-কথনে বঙ্কিম ১৫৯

অধ্যায় আট
বঙ্কিম-বঙ্গদর্শন-রবীন্দ্রনাথ ১৬৮

অধ্যায় নয়
বন্দে মাতরম্ : বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৯১

অধ্যায় দশ
পত্রিকা-সংবাদে বঙ্কিম-রবীন্দ্র ১৯৪

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের দুই যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। জন্মসূত্রে বয়সের ফারাক দুই দশকের বেশি– তেইশ বছর। উভয়ের বিচরণ-ক্ষেত্র সাহিত্যসাধন। একজন 'সাহিত্য-সম্রাট' অভিধায় অভিহিত, আর একজন 'বিশ্বকবি' মর্যাদায় আসীন। সময়ের হিসেবে দুজনের সহ-অবস্থান তিন দশকের বেশি। ১৮৬১ থেকে ১৮৯৪– এই সুদীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে একত্রে পেয়েছে বাংলা সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে সে এক স্বর্ণযুগ।

দুয়ের দেখা-সাক্ষাৎ, বাদ-প্রতিবাদ; অগ্রজ বঙ্কিমের সাহিত্য নিয়ে অনুজ রবীন্দ্রনাথের অনুভব বিশ্লেষণ মূল্যায়ন স্বাভাবিক। এসব ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের কথনে-বচনে-লেখনীতে আর সমকালীন পত্রে। রবীন্দ্রনাথের আছে বঙ্গদর্শনসূত্রে বঙ্কিমের উত্তরাধিকারিত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এমন রচনা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পাঠক সমীপে উত্থাপন করাই বর্তমান প্রয়াস। রবীন্দ্র-রচনা এবং আনুষঙ্গিক গ্রন্থ থেকে নানা তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এই গ্রন্থে। সংকলিত হয়েছে প্রাসঙ্গিক রচনাসমূহ।

প্রতিটি রচনার শুরুতে আছে 'উদ্ধৃত রচনা'র উৎস সন্ধান এবং প্রয়োজনীয় টীকা। সংযুক্ত হয়েছে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি।

গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে 'বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্পর্ক-সন্ধান'। পাঠক তেমন সম্পর্ক সন্ধানে আরও উৎসাহী হয়ে বাংলা সাহিত্যের কালিক ইতিহাস সন্ধানে ব্রতী হলে শ্রম সার্থক বিবেচিত হবে।

ঐতিহ্য প্রকাশনা সংস্থা গ্রন্থ প্রকাশে এগিয়ে আসায় আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রচ্ছদ নির্মাতা ধ্রুব এষকে।

বদিউর রহমান
২০ অক্টোবর ২০২৪

অধ্যায় এক

কবিতা

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা রচনা। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, 'কবি যখন কালিম্পঙে, সেই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; তদুপলক্ষে কবি পূর্বাহ্ণে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ১০ আষাঢ় (১৩৪৫ ॥ ২৫ জুন ১৯৩৮) সভায় পঠিত হয়। সুতরাং কবিতাটি নিশ্চয়ই কয়েকদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল'। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' পত্রের আষাঢ় ১৩৪৫ সংখ্যায়। পরের মাসেই প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'র শ্রাবণ ১৩৪৫ সংখ্যায়।

কবিতাটি সংকলিত হয়েছে বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর (রেক্সিন বাঁধাই) একত্রিংশ খণ্ডে (১৪০৭)। রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় পর্বে এই কবিতা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে–

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১০ আষাঢ় ১৩৪৫ অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে (অভিজ্ঞান সংখ্যা ১৫৯) কবিতাটির একটি পূর্ণরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাশিত কবিতা হইতে অনেকাংশে পার্থক্য থাকায় শিরোনামহীন কবিতাটি এখানে সংকলিত হইল।

আমরাও বর্তমান পরিচ্ছেদের পরিশিষ্টে ওই 'শিরোনামহীন কবিতা'টি সংযুক্ত করলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভেছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি;
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠেনা যার, দিনান্তের অবশার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পুরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগ সাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বক্ষের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে!
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গকল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

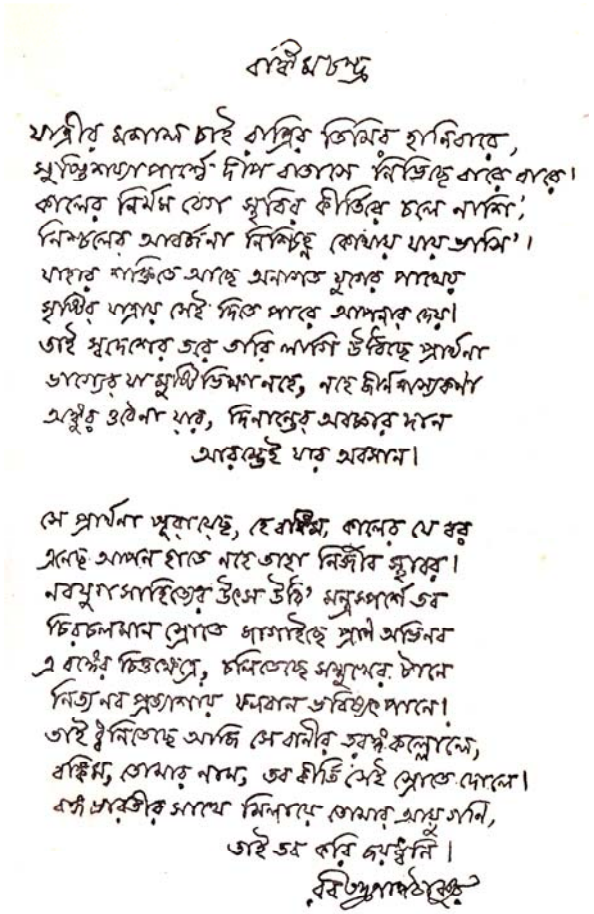

বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি',
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পূরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগ সাহিত্যের উৎসে উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গকল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গনি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

শিরোনামহীন কবিতা

আপন অশ্রান্ত বেগে সৃষ্টি চলিয়াছে যাত্রা করি
নিরন্তর দিবা-বিভাবরী ।
স্তব্ধ যাহা পথপার্শ্বে অচৈতন্য যা রহে না জেগে,
ধূলি বিলুণ্ঠিত হয় কালের চরণঘাত লেগে ।

নদী যদি ক্লান্ত হয় মহাসমুদ্রের অভিসারে,
অবরুদ্ধ হয় পঙ্কভারে ।
নিশ্চল গৃহের কোণে কাঁপে, স্তিমিত নিভৃতে সেই বাতি
দরিদ্র আলোক তার লুপ্ত হয়, না ফুরায়ে রাতি ।
যাত্রীর মশালে জ্বলে দীপ্ত আলো জাগ্রত নিশীথে,
জানে না সে আঁধারে মিশিতে ।

যাহার অন্তরে নাই অনাগত যুগের পাথেয়
জানি সে কালের কাছে হেয় ।
কীর্তিনাশা স্মৃতিনাশা নির্মম স্রোতের ধারে ধারে-
পড়ে আছে অতীতের পরিত্যক্ত খ্যাতি সারে সারে ।
আপনার অর্থ তারা হারায়েছে, হারায়েছে গতি
অন্ধ রাতে হারায়েছে জ্যোতি ।
তাই স্বদেশের তরে, তারি লাগি ধ্বনিছে প্রার্থনা,
সেই দান লাগি, যাহা নহে জীর্ণপ্রাণ শুষ্ক শস্যকণা ।
উঠে না অঙ্কুর যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান,
আজ গেলে কাল অবসান ।
পেয়েছে তোমার হাতে তব দেশ, কালের যে বর,
হে বঙ্কিম, নহে সে স্থাবর ।
নব-সাহিত্যের উৎস উৎসারিত মন্ত্রস্পর্শে তব

চির-চলমান গতি, জাগাইয়া প্রাণ অভিনব ।
এ-বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলে স্রোত সম্মুখের টানে
ফলবান ভবিষ্যৎ-পানে ।
তাই নিত্য ধ্বনিতেছে সে বাণীর তরঙ্গ- হিল্লোলে-
হে বঙ্কিম, তব নাম তব খ্যাতি তারি স্রোতে দোলে ।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই মোরা করি জয়ধ্বনি ।

[কালিম্পঙ । জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ? ১৩৪৫]

অধ্যায় দুই

বঙ্কিম-রবীন্দ্র নৈকট্য-দূরত্ব

১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনস্মৃতি'র ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় এই লেখা। এর শিরোনাম 'বঙ্কিমচন্দ্র'।
'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন একান্ন। এর আগে 'জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রবাসী' পত্রে। 'প্রবাসী'র ভাদ্র ১৩১৮ থেকে থেকে শ্রাবণ ১৩১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'জীবনস্মৃতি'। 'জীবনস্মৃতি' সংকলিত আছে বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র (রেক্সিন-বাঁধাই) সপ্তদশ খণ্ডে (১৩৫০)।

বঙ্কিমচন্দ্র

এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি সে অনেকদিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বোধ করি তিনি আশা করিয়াছিলেন, কোনো-এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব– সেই ভরসায় আমাকেও মিলনস্থানে কী একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যুবা বয়স ছিল। মনে আছে, কোনো জর্মান যোদ্ধৃকবির যুদ্ধকবিতার ইংরেজি তর্জমা তিনি সেখানে স্বয়ং পড়িবেন,

এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আমাদের বাড়িতে সেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবি বীরের বামপার্শ্বের প্রেয়সী সঙ্গিনী তরবারির প্রতি তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসগীতি যে একদিন চন্দ্রনাথবাবুর প্রিয় কবিতা ছিল ইহাতে পাঠকেরা বুঝিবেন যে, কেবল যে এক সময়ে চন্দ্রনাথবাবু যুবক ছিলেন, তাহা নহে, তখনকার সময়টাই কিছু অন্যরকম ছিল।

সেই সম্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র– যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে, তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে, কেবলমাত্র, তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড়ো বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে নে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাগার, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারো সঙ্গে যেন তাঁর 'কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোটো ঘটনা ঘটিল, তাহার ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে, অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

তাহার পরে অনেকবার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু উপলক্ষ ঘটে নাই। অবশেষে একবার যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা

হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ, আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভর করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।

তাহার পরে বয়সে আরো কিছু বড়ো হইয়াছি। সে-সময়কার লেখকদলের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া একটা আসন পাইয়াছি, কিন্তু সে-আসনটা কিরূপ ও কোন্‌খানে পড়িবে তাহা ঠিকমত স্থির হইতেছিল না; ক্রমে ক্রমে যে একটু খ্যাতি পাইতেছিলাম তাহার মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা ও অনেকটা পরিমাণে অবজ্ঞা জড়িত হইয়াছিল; তখনকার দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বিলাতি ডাকনাম ছিল; কেহ ছিলেন বাংলার বায়রন, কেহ এমার্সন, কেহ আর-কিছু; আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন– সেটা শেলির পক্ষে অপমান এবং আমার পক্ষে উপহাসস্বরূপ ছিল; তখন আমি কলভাষার কবি বলিয়া উপাধি পাইয়াছি। তখন বিদ্যাও ছিল না, জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গত পদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশি, সুতরাং তাহাকে ভালো বলিতে গেলেও জোর দিয়া প্রশংসা করা যাইত না। তখন আমার বেশভূষা-ব্যবহারেও সেই অর্ধস্ফুটতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল; চুল ছিল বড়ো বড়ো এবং ভাবগতিকেও কবিত্বের একটা তুরীয় রকমের শৌখিনতা প্রকাশ পাইত। অত্যন্তই খাপছাড়া হইয়াছিলাম, বেশ সহজ মানুষের প্রশস্ত প্রচলিত আচার-আচরণের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়া সকলের সঙ্গে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারি নাই।

এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় নবজীবন মাসিকপত্র বাহির করিয়াছেন– আমিও তাহাতে দুটা একটা লেখা দিয়াছি।

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচার বাহির হইতেছে। আমিও তখন প্রচারে একটি গান ও কোনো বৈষ্ণব-পদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য-ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছি।

এই সময়ে কিম্বা ইহারই কিছু পূর্ব হইতে আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশিকিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত, আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত

না। এক-একদিন দেখিতাম সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে সে-লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত– ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে-বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার' পত্রে তিনি যে ধর্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম, আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্র আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচারে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে; তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে– যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

২

বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২৯১-র শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রচার' পত্রে। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেন 'একটি পুরাতন কথা'। 'একটি পুরাতন কথা' প্রকাশিত হয় একই বছর 'ভারতী' পত্রের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। দেখা যায় 'হিন্দুধর্ম'-র তিন মাসের মাথায় প্রকাশিত হয় 'একটি পুরাতন কথা'। পরে 'একটি পুরাতন কথা' 'সমালোচনা' গ্রন্থভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'সমালোচনা' প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয় বাংলা ১২৯৪ সালে (১৮৮৮)।

'সমালোচনা' গ্রন্থভুক্ত 'একটি পুরাতন কথা' এবং 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত 'একটি পুরাতন কথা'র মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। গ্রন্থভুক্ত হওয়ার কারণেই এই পরিবর্তন। অমিয়সূদন ভট্টাচার্য 'ভারতী' থেকে উদ্ধার করে এটি প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক গ্রন্থে। এই 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রকাশিত হয় ১৩৮৪ (১৯৭৭) সনে। অমিয়সূদন ভট্টাচার্য 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের সংকলক। এর প্রকাশক বিশ্বভারতী।

'একটি পুরাতন কথা' সংবলিত 'সমালোচনা' প্রবন্ধগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র (রেক্সিন বাঁধাই) অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৪৮)।

'একটি পুরাতন কথা' দ্বিতীয়বার সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সমাজ' শীর্ষক রচনা সংগ্রহে। 'সমাজ' সংকলিত আছে বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র (রেক্সিন বাঁধাই) ত্রিংশ খণ্ডে (১৪০৪)। এর গ্রন্থপরিচয় পর্বে উল্লেখ আছে– 'রবীন্দ্রনাথের সমাজ-বিষয়ক বহু রচনা বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে ঊনবিংশ-শতাব্দীতে লিখিত উক্ত বিষয়ের অগ্রন্থিত রচনাগুলি সংকলিত হইল'। এই পর্বে সংকলিত ২৮ প্রবন্ধের মধ্যে 'একটি পুরাতন কথা' ষোড়শ সংখ্যক প্রবন্ধ।

অমিয়সূদন ভট্টাচার্য সংকলিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থ থেকেই 'একটি পুরাতন কথা' সংকলিত হলো।

একটি পুরাতন কথা

অনেকেই বলেন, বাঙালীরা ভাবের লোক, কাজের লোক নহে। এইজন্য তাঁহারা বাঙালীদিগকে পরামর্শ দেন Practical হও। ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করিলাম। কারণ, ঐ কথাটাই চলিত। শব্দটা শুনিলেই সকলে বলিবেন, 'হাঁ হাঁ, বটে, এই কথাটাই বলা হইয়া থাকে বটে।' আমি তাহার বাঙালা অনুবাদ করিতে গিয়া অনর্থক দায়িক হইতে যাইব কেন? যাহা হউক তাহাদের যদি জিজ্ঞাসা করি, Practical হওয়া কাহাকে বলে, তাঁহারা উত্তর দেন– ভাবিয়া চিন্তিয়া ফলাফল বিবেচনা করিয়া কাজ করা, সাবধান হইয়া চলা, মোটা মোটা উন্নত ভাবের প্রতি বেশি আস্থা না রাখা, অর্থাৎ ভাবগুলিকে ছাঁটিয়া ছুটিয়া কার্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লওয়া। খাটি সোনায় যেমন ভালো মজবুত গহনা গড়ানো যায় না, তাহাতে মিশাল দিতে হয়, তেমনি খাঁটি ভাব লইয়া সংসারের কাজ চলে না, তাহাতে খাদ মিশাইতে হয়। যাহারা বলে সত্য কথা বলিতেই হইবে, তাহারা Sentimental লোক, কেতাব পড়িয়া তাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, আর যাহারা আবশ্যকমত দুই-একটা মিথ্যা কথা বলে ও সেই সামান্য উপায়ে সহজে কার্যসাধন করিয়া লয় তাহারা Practical লোক।

এই যদি কথাটা হয়, তবে বাঙালীদিগকে ইহার জন্য অধিক সাধনা করিতে হইবে না। সাবধানী ভীরু লোকের স্বভাবই এইরূপ। এই স্বভাব-বশতই বাঙালীরা বিস্তর কাজে লাগে, কিন্তু কোনো কাজ করিতে পারে না। চাকরি করিতে পারে কিন্তু কাজ চালাইতে পারে না।

উল্লিখিত শ্রেণীর practical লোক ও প্রেমিক লোক এক নয়। practical লোক দেখে ফল কি– প্রেমিক তাহা দেখে না, এই নিমিত্ত সেইই ফল পায়। জ্ঞানকে যে ভালোবাসিয়া চর্চা করিয়াছে সেই জ্ঞানের ফল পাইয়াছে; হিসাব করিয়া যে চর্চা করে তাহার ভরসা এত কম যে, যে-শাখাগ্রে জ্ঞানের ফল সেখানে সে উঠিতে পারে না, সে অতি সাবধান-সহকারে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ফল পাইতে চায়– কিন্তু ইহারা প্রায়ই বেঁটে লোক হয়– সুতরাং 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" হইয়া পড়ে।

বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সংকুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়। এইজন্য বয়স হইলে সংসারের উপর হইতে বিশ্বাস হ্রাস হইলে পর তবে সাবধানিতা বিজ্ঞতা আসিয়া পড়ে। এই অবিশ্বাসের আধিক্য হেতু অধিক বয়সে কেহ একটা নূতন কাজে হাত দিতে পারে না, ভয় হয় পাছে কার্য সিদ্ধ না হয়– এই ভয় হয় না বলিয়া অল্প বয়সে অনেক কার্য হইয়া উঠে, এবং হয়তো অনেক কার্য অসিদ্ধও হয়।